# রাহুল সাংকৃত্যায়ন

ড: অচিন্ত্যকুমার মাইতি

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

# ।। মুখবন্ধ ।।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। রাহুলের সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁর জীবন ইতিহাস চার ভাগে বিভক্ত যথা—(১) সন্ন্যাস জীবন (২) পরিব্রাজক জীবন (৩) রাজনৈতিক জীবন (৪) সাহিত্যিক জীবন। জীবনে স্থায়ীভাবে কোনো পথকে বেছে নেননি। এগুলোর মধ্যে থেকে তিনি যদি একটি পথকে স্থায়ীভাবে বেছে নিতেন, তাহলে আরও অজস্র মূল্যবান জিনিসের প্রাপ্তি ঘটত যা থেকে দেশ সমৃদ্ধ হত। সবচেয়ে অবাক লাগে যে, প্রথাগত শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছিল। ভারতের একজন স্বনামধন্য পর্যটক, বৌদ্ধ সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মার্কসীয় শাস্ত্রে দীক্ষিত, জীবনের ৪৫ বছর ব্যয় করেছেন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাদানে সুদক্ষ, ৩৫টি ভাষায় ভাষাবিদ এবং সুলেখক, ১৫০-এর অধিক গ্রন্থের রচয়িতা, হিন্দি ভ্রমণসাহিত্যের জনক প্রভৃতি এমন বহুগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বের ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ কয়েকজন ক্ষণজন্মা মনীষীর আবির্ভাব ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের মতো বিস্মৃতপ্রায় মনীষীদের জীবনকথা আজকের এই অবক্ষয়প্রাপ্ত জাতির মনে চেতনা ও প্রেরণা আনে, সেই আশায় রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবন ও চরিত্র চিত্রণের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কলকাতা
জানুয়ারি, ২০১৯

নিবেদক
ড. অচিন্ত্যকুমার মাইতি

*"Oh! ignorant, go and travel all over the world. You will not get this life again.*

*Even if you live long, youth will never return."*

Rahul Sankrityayan

# সূচীপত্র


| | |
|---|---|
| প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্মস্থান ও বংশ পরিচয় | ১৩ |
| দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শৈশব | ১৭ |
| তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কৈশোর | ২৭ |
| চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বৈরাগ্য | ৩৬ |
| পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জ্ঞানান্বেষণে বিশ্বপরিক্রমা | ৪৬ |
| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে | ৫৬ |
| সপ্তম পরিচ্ছেদ : সাহিত্যের আঙিনায় | ৬৭ |
| অষ্টম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত জীবন | ৭৯ |
| নবম পরিচ্ছেদ : উপসংহার | ৮৮ |
| জীবনপঞ্জি | ৯৩ |

## ॥ প্রথম অধ্যায় ॥

# জন্মস্থান ও বংশপরিচয়

১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল রবিবার উত্তরপ্রদেশের পন্ডাহা জেলায় আজমগড় গ্রামে কেদারনাথ পান্ডে যিনি পরবর্তীকালে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে পরিচিত হন, মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোবর্ধন পান্ডে ও মাতা কুলবন্তী দেবী। মাতামহ রামশরণ পাঠকের অভিভাবকত্বেই তাঁর বাল্যজীবন কাটে। বিয়ে হওয়ার পরও মা বেশিরভাগ সময় পন্ডাহার বাড়িতেই থাকতেন। রামশরণের প্রথম সন্তান হয়েছিল পুত্র, কিন্তু অল্পবয়সে সে মারা যায়। ১৮৭৬ সালে কুলবন্তীর জন্ম। কুলবন্তী তাঁর শেষ ও একমাত্র সন্তান হওয়ায় খুব আদরের ছিলেন। ৯ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। রামশরণ সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। রাহুল যখন জন্মায় রামশরণ দশ-বারো বছর চাকরি করার পর সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর তিন একরের মতো জমি, দুটি বলদ ছিল। জমিতে চাষ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

১৮৪৪ সালে রামশরণের জন্ম। তিনি ছিলেন পিতার মধ্যম পুত্র। তার বড়ো ও ছোটো ভাইয়ের নাম যথাক্রমে শিবনন্দন ও রামচরণ। রামশরণ লম্বায় প্রায় ছ-ফুট, চওড়া বুক, গায়ের রং বাদামি। দিদিমা দোহারা চেহারার ছিলেন, অধিকাংশ চুল সাদা হলেও দিদিমার শেষ দিন পর্যন্ত একটিও দাঁত পড়েনি। ঘরকন্নার ব্যাপারে দিদিমাই সর্বেসর্বা, তাঁর ওপর জোর করার কেউ ছিল

না। দাদু দিদিমার কথা খুব মেনে চলতেন। ভোর থাকতে থাকতে দিদিমা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তেন, সারাদিন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, রাত দশটা এগারোটা নাগাদ তাঁর শুতে আসার সময় হত। রাহুল যখন মায়ের বুকের দুধ ছেড়ে দেন, তখন থেকে তাঁকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি দিদিমার কাছেই শুতেন। দিদিমা নানা রকমের গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন। ফলে রাহুল দিদিমাকে যতটা ভালোবাসতেন, মার প্রতি তাঁর ততটা ভালোবাসা ছিল না। জীবনের প্রথম পাঁচ বছর দিদিমার স্নেহে রাহুল কেবলমাত্র লালিত-পালিত হননি, দিদিমা তাঁকে তৈরিও করেছিলেন। দিদিমা পশুপাখি খুব ভালোবাসতেন। বিশাল উঠানে পাখিগুলো যখন এসে বসত, দিদিমা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাদের খাবার দিতেন। শুধু আত্মীয়-স্বজনরা দিদিমার আতিথ্য পেত তাই নয়, পথ-চলা পথিক ও ভিখারিরাও তাঁর আতিথেয়তা থেকে বঞ্চিত হত না।

ছেলেবেলাতেই রাহুল দাদুর কাছে উর্দুভাষা শিখেছিলেন এবং সেকারণেই তাঁর প্রথম থেকেই আকর্ষণ ছিল উর্দুভাষাতে। দাদুর কাছে তাঁর সৈনিকজীবনের নানা রোমাঞ্চকর গল্প ও বিভিন্ন দেশভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনে শুনে ছেলেবেলা থেকেই রাহুল রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হয়ে ওঠেন।

তাঁর পৈত্রিক গ্রাম পন্ডাহা থেকে মাইল দশেক দূরে, গ্রামের নাম কনৈলা। এই গ্রামে পান্ডে বংশের খুব নাম ডাক ছিল। পূর্বপুরুষেরা জমিদার ছিলেন। ব্রাহ্মণদের গায়ের রং সাধারণত ফরসা হয়, কিন্তু পান্ডেদের গায়ের রং ছিল কালো। এখনও পান্ডে বংশের লোকেরা কালোই আছে। নিজেরা জমিতে চাষ করত না। ভর, চামার প্রভৃতি জাতির লোকেরা তাদের জমিতে

চাষ-আবাদ করত, পান্ডেরা শুধু দেখাশোনা করত। পরবর্তীকালে সে জমিদারী লোপ পায়। রাহুলের পিতা গোবর্ধন পান্ডে গ্রামের জমিদারের কাছারিতে চাকরি করতেন। তাঁর গায়ের রং ছিল খুব কালো, লম্বায় প্রায় ছ-ফুট, স্বাস্থ্যবান ছিলেন, অসুখ বিসুখ বিশেষ কিছু ছিল না। মা কুলবন্তীর চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল।

পিতা গোবর্ধনের চেহারা, প্রায় একই রকম লম্বা, কিন্তু গায়ের রং ছিল ফরসা। রাহুলের পিতা খুব দৃঢ়চেতা ছিলেন। কুসংস্কারকে কখনও প্রশয় দিতেন না। ব্রাহ্মণের কঠোর বিধান লঙ্ঘন করে গোবর্ধন তাঁর চাষি নিঃসন্তান 'চিন গী' চামারের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা করে বিচিত্র আকারের লম্বা-চওড়া ইট ব্যবহার করে কূপের নীচের দিকটা চওড়া ও ওপরের দিকটা সংকীর্ণ এরূপ একটা নতুন কূপ খনন করেছিলেন। তিনি খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি স্নান-পুজোর আগে জল পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না। তখন গ্রামের লোক মনে করত আহ্নিক হল সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত পণ্ডিতের কাজ। গোবর্ধন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু আহ্নিক করতেন। তাঁকে কেবলমাত্র রামায়ণ ও হনুমান-বাহুক পাঠ করতে দেখা যেত। গোবর্ধন স্নান করে শিবের মাথায় জল ঢেলে বেলপাতা চাপাতেন। তারপর গুড়, ঘি ও ধূপ দিয়ে পাঠ শুরু করতেন। এত নিষ্ঠা সহকারে পুজো করা দেখে গ্রামের লোকেরা তাঁকে পূজারি বলত। মা কুলবন্তীও খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পন্ডাহার বাড়িতে দেওয়ালির পরের দিন মহাধূমধামে গোধন পুজো হত। কুলবন্তী খুব নিষ্ঠা সহকারে এই পুজো করতেন। এতে কুলবন্তীর সইরা অংশ গ্রহণ করতেন। অধিক রাত পর্যন্ত কুলবন্তী ও তাঁর সইরা ভক্তিগীতি গাইতেন। পিতা

গোবর্ধন অল্প পড়াশোনা করলেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টাতে অল্প সময়ের মধ্যে শুধু রামায়ণই নয়, ভগ্নাংশ, গুণ, ভাগ, সুদকষা এবং জমি জরিপেরও হিসাব শিখে নিয়েছিলেন।

রাহুলের পিতামহ জানকী পান্ডের তিন খুড়তুতো ভাই ছিল। তাদের তিনি নিজের ভাই হিসাবে ভাবতেন। খুড়তুতো ভাইদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন মহাদেব। রাহুলের পিতামহ মহাদেবকে খুব স্নেহ করতেন। তারা একই সঙ্গে থাকতেন। যখন একান্নবর্তী পরিবার ছিল, তখন মহাদেব পান্ডের ছেলে বিরজুর জন্ম হয়। বিরজু রাহুলের চেয়ে কয়েক দিনের বড়ো। রাহুল তাঁকে বিরজু কাকা বলে ডাকতেন। রাহুলের দাদু-দিদিমা দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। রাহুলের ঠাকুরমা দীর্ঘায়ু ছিলেন, পিতামহের মৃত্যু হয়েছিল চল্লিশ বছর কাটতে না কাটতেই। মা আটাশ বছর বয়সে আর পিতা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা যান।

## ।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

# শৈশব

১৮৯৭ সালে সারাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, রাহুলের বয়স তখন চার বছর। গ্রামের পর গ্রাম লোকশূন্য। পন্ডাহা-কনৈলার মানুষ কিভাবে না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল, পশুদেরই বা কি হাল হয়েছিল, সেসময়ের স্মৃতি তাঁর মধ্যে না থাকলেও পরবর্তীকালে সেই মর্মস্পর্শী করুণ ঘটনা দাদুর কাছে প্রায়ই শুনতেন। অবশ্য রাহুলের দাদু বা পিতার কারু ঘরেই দুর্ভিক্ষের কোনো আঁচ লাগেনি। পিতা গোবর্ধনের জমি ছিল দশ-বারো একর আর দাদুর জমির পরিমাণ তিন একর। দাদুর চেয়ে পিতার অবস্থা ভালো ছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে সবজি বিক্রি করে পিতা যে লাভ করেছিলেন তা আগের তুলনায় অনেক গুণ বেশি।

রাহুলের শৈশবের অনেকটা সময় কেটেছে দাদুর সান্নিধ্যে। রামশরণের তিন নাতির মধ্যে রাহুল ছিলেন জ্যেষ্ঠ। সেই কারণে তিনি খুব আদরের ছিলেন। তাঁকে নিয়ে দাদুর খুব উচ্চ আশা ছিল। দাদু তাঁর প্রিয় নাতিকে সব সময় চোখে চোখে রাখতেন। দাদু প্রয়োজনে তাঁকে শাসন করতেন, তবে মারধর করে নয়, এমন হুমকি দিতেন তা রাহুলের কাছে পঞ্চাশ লাঠির ঘায়ের সামিল। দাদু খেলাধুলা খুব একটা পছন্দ করতেন না। ফলে রাহুলের কোনোকালে গাছে চড়া হয়ে ওঠেনি। দাদুর কঠোর শাসনের ফলে তাঁর সাঁতার শেখা হয়নি। পন্ডাহাতে একদিন রাহুল